استعينوا بالصبر والصلوة

আশুরাতে মাতম করা ও তাজিয়া বের করা কি বৈধ?

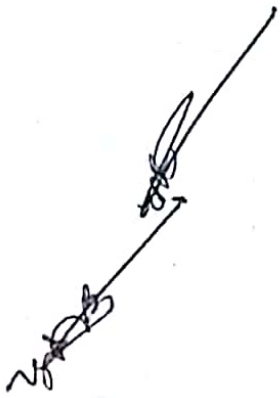

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

সার্বিক সহযোগিতায় :
হযরতুলহাজ্ব মৌলানা
আবুল আছাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী
শিক্ষক (ফরায়েজ বিভাগ)
জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া।
তত্ত্বাবধানে :
ক্যাপ্টেন আলহাজ্ব আবু জাফর মোহাম্মদ আনাম চৌধুরী
সহযোগিতায় :
মাওঃ খোরশেদুল আলম, আবুল ফারাহ মোহাম্মদ জুনাইদ,
মোঃ রুকুন উদ্দীন (ইরফান) ও হাফেজ আবু হানিফা
প্রকাশকাল : ১ম সংরক্ষণ
১লা জানুয়ারী ২০০৮ ইংরেজী
কম্পিউটার কম্পোজ :
কে,এম, জুনাইদ মোবাইল : ০১৮১৯-৩৬২৫৯৪
মুদ্রণ ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে : এম, বেলাল হুসাইন সিরাজী
ডিজাইন ও প্রসেস : এ্যাড. এম. কে
৭.জি, এ, ভবন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৬১৬০১৫
প্রকাশনায় : হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) প্রকাশনা সংস্থা।
প্রাপ্তিস্থান : মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২নং শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০৩১-৬১৮৮৭৪, ০১৮১৯-৬২১৫১৪
রেজভী কুতুবখানা
আজিজিয়া কুতুবখানা
৯৯ শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা) আন্দরকিল্লা.
মোবাইল : ০১৮১৯-৭৫১৪৮৭

শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র

সম্পাদনায়

সুলতানুল ওয়ায়েজীন
হযরতুলহাজ্ব মৌলানা আবুল কাশেম নুরী (মঃ জিঃ আঃ)

লেখক

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী
আরবী প্রভাষক :
কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

খতীব : হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) জামে মসজিদ,
সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৫-৯১৮৮৮২

উৎসর্গ

সাইয়্যদুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রহঃ)

মাওয়ানা মাল্‌জানা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহঃ)

গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)

আব্বাজান মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা মাহবুবুল আলম রজভী (রহঃ)

কৃতজ্ঞতায়

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার সকল শিক্ষক মন্ডলী

খাজা কালু শাহ (রহঃ) কমপ্লেক্স এর সকল সদস্য বৃন্দ

মামাজান আল্‌হাজ্ব বজলুল কাদের আল্ কাদেরী (বুলবুল)

অধ্যক্ষ মাওলানা খোরশেদুল আলম

উপাধ্যক্ষ মাওলানা ইছমাইল নোমানী

কাটির হাট এম,আই ফাজিল মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষক মন্ডলী

ও

মুহাম্মদ জানে আলম

সুচী পত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	কিয়ামতের ময়দানে ধৈর্য ধারণ কারীদের অবস্থা	০৬
২।	জান্নাতে ধৈর্যশীলদের মর্যাদা	০৭
৩।	মুমিনদের গুন	০৮
৪।	মছিবতে ধৈর্যের উপকার	১০
৫।	আমল বরবাদ	১২
৬।	শাহাদত বড় নেয়ামত	১২
৭।	হযরত আলী (রাঃ) এর অছিয়ত	১৩
৮।	ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর অবস্থা	১৪
৯।	জান্নাতে কামনা	১৪
১০।	শহীদের শারীরিক অবস্থা	১৫
১১।	মাতম না করার অছিয়ত	১৬
১২।	মা ফাতেমার (রাঃ) প্রতি অছিয়ত	১৭
১৩।	হযরত আলী (রাঃ) এর অবস্থা	১৮
১৪।	মহিলাদের বায়াত	২০
১৫।	জাহেলী যুগের কাজ	২১
১৬।	খুনাসার ঘটনা	২২
১৭।	আমর ইবনুল আসের (রাঃ) এর অছিয়ত	২৪
১৮।	প্রথমে মাত কে করেছে	২৫
১৯।	ইয়াজিদের ঘরে মাতম	২৬
২০।	আব্দুল আজিজ (রাঃ) এর ফতোয়া	৩০
২১।	আলা হযরতের ফতোয়া	৩১
২২।	সদরুশ্ শরীয়তের ফতোয়া	৩৩

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আপন বান্দাদেরকে ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার হুকুম দেন। অসংখ্য দরূদ সালাম ঐ নবী (দঃ) এর উপর, যিনি ধৈর্যশীল ছিলেন এবং আপন উম্মতকে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দেন, তার পরিবার ও আসহাবের উপর যারা ধৈর্য ধারণ করে ইসলামের পতাকাকে উড্ডিন করেছিলেন।

সম্মানিত পাঠক ভাইয়েরা, আজ আমরা ইসলাম ধর্মকে আমাদের পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বাভাবিকভাবে পেয়ে গেলাম, কিন্তু ঐ ইসলামকে গোটা বিশ্ব ব্যাপী পৌছাতে অনেক আল্লাহর বান্দাদেরকে ধৈর্যের সাথে কাজ চালাতে হয়েছিল। মুসলিম জাতির যতদিন ধৈর্য ছিল, ততদিন উন্নতির শিখরে উপনীত ছিলেন, আর যখন ধৈর্যকে হারিয়ে ফেলে, ধীরে ধীরে সেই মান-সম্মান নেত্রীত্ব সব হারাতে থাকে। বর্তমান মুসলিম সমাজ আরাম আয়েশ প্রিয়। একটু কষ্ট করতে তারা রাজি নন। অথচ নবী (দঃ) ও তার সাহাবাদের জীবন পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, তাঁরা কত কষ্টের মাধ্যমে এই ইসলামকে কায়েম করেছেন। তাদের পরে নবী (দঃ) এর আওলাদ ও আল্লাহ তায়ালার মাকবুল বান্দা, যাদের আমরা আল্লাহর অলি হিসেবে চিনি, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অস্বাভাবিক ধৈর্যের মাধ্যমে ইসলামকে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা যদি এভাবে আরাম আয়েশ প্রিয় থাকত, কখনো ইসলামের পতাকা উড্ডিন করতে পারতেন না। আজ আমরা নিজেদের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করছিনা, সাথে সাথে যারা ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ইসলাম কায়েম করেছেন, যাদের তাজা রক্তের বদলায় ইসলাম এই পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আছে, তাদের কুরবাণীর উপর আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা, যেমন মুহরমের দশ তারিখ ময়দানে করবালায় আওলাদে রাসুল (দঃ) ইমাম আলী মকাম হুসাইন ইবনে আলী (রঃ) ও তার আওলাদের তাজা রক্তকে ঢেলে দিয়েছিলেন, ইসলামকে জীবিত রাখার লক্ষ্যে, উনারা ছিলেন বাস্তব কুরআন। কুরআনের আয়াতের তাফসীর, তারজুমা ইত্যাদি উনারা বলার মাধ্যমে করতেন না বরং বাস্তবতার মাধ্যমে করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

استعينوا بالصبر والصلوٰة

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য চাও,

দেখা যায় এই আয়াতের বাস্তবতা ঘটালেন ময়দানে কারবালায় আওলাদে রাসুল (দঃ) ও তার প্রিয়জনরা। উনাদের কে প্রিয় জন্মভূমি মদিনা মুনাওয়ারাকে ছেড়ে দিয়ে, মক্কা হয়ে সেই কারবালা পর্যন্ত এসে, একে অপরের সামনে আপন রক্তকে ঢেলে দিতে হয়েছিল। এমন কি ইমাম হুসাইন (রাঃ) রক্তমাখা শরীর দিয়ে, ইয়াজীদিদের থেকে সময় চেয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলে, আল্লাহ দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে নামাজের সিজদার মাধ্যমে। দেখা গেল কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালার বাণীর সাথে ইমাম হুসাইনের জীবনের সাথে মিলে যায়। এটা একটা শুকরিয়ার ব্যাপার, কান্নার কারণ নয়, ইমাম হুসাইন (রাঃ) পরাজিত হন নাই বরং উনি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তার রক্তের বদৌলতে ইসলামকে জীবিত রেখেছেন এবং শাহাদাতের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? যেই নেয়ামতকে শহীদরা জান্নাতে গিয়েও তালাশ করবে। ইমাম হুসাইন (রাঃ) তো নিয়ামতের সাগরে ডুব দিয়েছেন, আমাদেরকে অধৈর্য্য হওয়ার কি কারণ? উনি ধবংশ হলে এভাবে অধৈর্য্য কারণ ছিল। তিনি ধবংশ হননি, এখনো জীবিত আছেন যার কথা আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء
ولكن لا تشعرون (بقره)

তোমরা ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে মৃত বল না যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমাদের সেই অনুভূতি নেয়।
অন্য আয়াত আল্লাহতায়ালা বলেন-

لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموات
بل احياء عند ربهم يرزقون

যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন, তোমরা তাদের মৃত বলে ধারণা কর না বরং তারা জীবিত শুধু তাই না, তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে রিযিক ও আসে।

উল্লেখিত তায়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, যারা ইসলামকে কায়েম করার লক্ষ্যে শহীদ হয়েছেন, তারা মৃত নন বরং জীবিত এবং রিযিক ও খাচ্ছেন। ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা মৃত নন, এখনো উনারা আছেন এবং খাওয়ার খাচ্ছেন। ধ্বংস হয়েছে, ইয়াজিদ ও তার বাহিনীরা যেমন এক কবি কত সুন্দর বলেছেন-

دور حیاۃ انگی ظالم فضا کے بعد
ہے ابتداء ہماری تری انتہاء کے بعد
قتل حسین اصل مین مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بعد

কবি ইমাম আলী মকাম (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন, অনেক হায়াত আসবে জালিম চলে যাওয়ার পর, হে হুসাইন (রাঃ) আপনার শাহাদতের মাধ্যমে আমাদের জীবন শুরু। আপনি শহীদ হয়েছেন, আর ধবংশ হল ইয়াজিদ এভাবে ইসলাম প্রত্যেক কারবালার পরে জীবিত হয়।

আমাদের দেশে অনেককে দেখা যায়, ইমাম হুসাইনের মুহব্বত দেখাতে গিয়ে, শরীরের উপর আঘাত আনে, এমনকি ছুরি দিয়ে নিজের শরীরকে রক্তার্ত করে ফেলে এবং রক্তার্ত অবস্থায় মিছিল বের করে। এটাতো ধৈর্যের প্রমাণ নয়, বরং ধৈর্য হল আপনি ইমাম হুসাইন (রাঃ) স্মরণে মাহফিল করুন এবং আওয়াজ ছাড়া কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলুন। এই চোখের পানি আপনার নাজাতের ও জান্নাত পাওয়ার বড় মাধ্যম হবে। আল্লাহ ও তার রাসুল (দঃ) এর ফয়সালা হল, নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করা এবং মছিবতে ধৈর্য ধারণ করা যেমন কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله
وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوت من ربهم ورحمة
واولئك هم المهتدون (سورة بقره)

হে রাসুল (দঃ) আপনি শুভ সংবাদ দেন এই সমস্ত ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য, যারা মছিবত আসলেই বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দিকে আমাদের প্রত্যবর্তন। আল্লাহ বলেন, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত রয়েছে, তারাই হিদায়ত প্রাপ্ত।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا

(سورة بالقصص ۵۴)

তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার কারণে দু'বার বদলা দেওয়া হবে।
(সুরা কছ্ছ- ৫৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বাণী

انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب (سورة الزمر ۱۰)

নিশ্চয় ধৈর্য ধারণ কারীদের প্রতিদান অসংখ্য নেয়ামতে ভরপুর করা হবে। (সূরা সুমুর ১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اصبروا ان الله مع الصابرين (سورة الانفال ۴۲)

তোমার ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ধৈর্য ধারণকারীর সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। (আনফাল ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

استعینو بالله واصبروا (سورة الاعراف ۱۲۸)

তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। (আরাফ ১২৮)

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ বলেন-

بلى ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ہذا یمددکم
ربکم بخمسة الاف من الملائكة مسومين (ال عمران ۱۲۵)

হ্যাঁ তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং মুত্তাকি হও, তাহলে উপর থেকে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঁচ হাজার ফেরেস্তা দলে দলে নাযিল হবে। (আলে ইমরান- ১২৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الصابرين فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک
الذین صدقوا واولئک ہم المتقون (سورة البقره ۱۷۷)

যখন আজাব চলে আসে এবং বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা স্বরূপ মছিবত চলে আসে, যারা ধৈর্য ধারণ করে, তারাই সত্যের মধ্যে আছে এবং তারাই মুত্তাকি। (সুরা বাকারা-১৭৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک
لہم مغفرة واجر کبیر (سوره ہود ۱۱)

হ্যাঁ যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বড় প্রতিদান রয়েছে। (সুরা হুদ ১১)

یا ایہا الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا (ال عمران ۲۰۰)

হে ঈমানদাররা, ধৈর্য ধারণ কর এবং একে অপরকে ধৈর্যের হুকুম দাও ও সম্পর্ক স্থাপন কর।

সূরা আছরে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملو
الصالحات وتواصو بالحق وتواصو بالصبر

নিশ্চয় সমগ্র মানব গোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্থ রয়েছে, হ্যাঁ যারা ইমান আনয়নের পর ভাল কাজ করে এবং একে অপরকে সত্যের অছিয়ত করে, একে অপরকে ধৈর্য ধারণের অছিয়ত করে, তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্থে নয়। (সূরা আছর)

উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় নিশ্চয় যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সতেচ্ছ নেয়ামতের শুভ সংবাদ আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়েছেন।

মছিবতে ধৈর্য ধারণ এবং নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় রাসুল (দঃ) আমাদেরকে উৎসাহিত করেন। যেমন- নবী (দঃ) এর বাণী-

قال النبی ﷺ یقول الله تعالى اذا وجہت الی عبد
من عبیدی مصیبة فی بدنه اوماله اوولده ثم استقبل
ذالک بصبر جمیل استحیت یوم القیامة ان انصب
له میزانا اوانشرله دیوانا (نزہة المجالس ج ۱ صفحہ ۲۵)

রাসুল (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার কোন বান্দাকে যদি তার শরীর, সম্পদ বা সন্তানের উপর মছিবত দিয়ে থাকি, বান্দা ধৈর্যের মাধ্যমে ঐ মছিবতের মোকাবিলা করলে, তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পাপ-পূণ্য মাপার দাড়িপাল্লা দাড় করতে বা তার আমলের খাতা খুলতে আমি লজ্জা পাই।
অর্থাৎ তাকে কোন ধরণের হিসাব ছাড়া জান্নাত দান করে দিয়ে থাকি।
(নুযহাতুল মাজালিস ১ খন্ড- পৃষ্ঠা ৬৫)
অন্য হাদিসে রাসুল (দঃ) এর বাণীঃ

عن ابن عباس عن النبى ﷺ من صبر على اداء فرائض الله فله ثلثمائة درجة ومن صبر عن محارم الله فله ستمائة درجة ومن صبر على المصيبة فله تسعمائة درجة
(نزهة المجالس ج ا صف ٢٥)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেন, কোন বান্দা আল্লাহ তায়ালার ফরজ আদায় করতে ধৈর্য ধারণ করলে, তার জন্য তিনশত মর্যাদা রয়েছে, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার নিষেধকৃত কাজে ধৈর্য ধারণ করে তার জন্য ছয়শত মর্যাদা, যে মছিবতে ধৈর্য ধারণ করে তার জন্য নয়শত মর্যাদা রয়েছে।
(নুযহাতুল মাছালিস ১ খন্ড পৃষ্ঠা-৬৫)

কিয়ামতের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারীদের অবস্থাঃ

যারা ধৈর্য ধারণ করেছিল তাদের অবস্থা কিয়ামতের ময়দানে কেমন হবে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

اذاكان يوم القيامة نادى مناد ليقم اهل الصبر فيقوم ناس فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتقول لهم الملائكة الى اين قالوا الى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من انتم قالوا نحن اهل الصبر قالوا كيف صبرتم قالوا

صبرنا انفسنا على طاعة الله وصبرنا انفسنا عن معا صى الله تعالى وصبرناها على البلاء والمحن فى الدنيا فتقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبى الدار (نزهة المجالس ج ا صف ٢٦)

যখন কিয়ামত কায়েম হবে, এক আহবানকারী আহবান করবে, ধৈর্য ধারণকারীরা দাড়িয়ে যাও, অতঃপর কতগুলো মানুষ দাড়াবে, তাদেরকে বলা হবে সোজা জান্নাতে চলে যাও। ফেরেস্তারা তাদেরকে বলবে, তোমরা কোথায় যাবে? তারা বলবে জান্নাতে। ফেরেস্তারা বলবে, হিসাবের পূর্বে? তারা বলবে হ্যাঁ। ফেরেস্তারা বলবে তোমরা কারা? তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীলরা ফেরেস্তারা বলবে, কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা অনুগত্য স্বীকারে নিজের উপর ধৈর্য করেছিলাম, আল্লাহর নাফরমানী কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেছিলাম এবং বিভিন্ন মছিবতে পৃথিবীতে ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। অতঃপর ফেরেস্তারা বলবে, দুনিয়াতে ধৈর্য দেখিয়েছিলে তার কারণে তোমাদেরকে সালাম এবং তোমাদের আখিরাতের ঘর কতই না সুন্দর।
(নুযহা ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৬৬)

জান্নাতে ধৈর্যশীলদের মর্যাদাঃ

আমরা জানি জান্নাত সব সমান নয়, একটার উপর অন্যটার মর্যাদা রয়েছে। একদা হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাতের প্রিয় স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قال موسى عليه السلام يا الهى اى منازل الجنة احب اليك قال حظيرة القدس قال ومن يسكنها قال اصحاب المصائب قال يارب من هم قال الذين اذا

ابتلیتہم صبروا واذاانعمت علیہم شکروا واذااصابتہم مصیبة قالوا انالله وانا الیه راجعون
(نزہة المجالس ج۱ صف۲۲)

হে মুছা (আঃ)! আমার প্রিয় স্থান হল "হাযিরাতুল কুদ্স" হযরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সেই স্থানে কে থাকবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা মছিবতে শিকার হয়েছিল। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, তারা কারা? আল্লাহ তায়ালা বললেন, যাদেরকে আমি মছিবত দিয়ে পরীক্ষা করলে, তারা ধৈর্য ধারণ করে। আমি তাদের উপর নিয়ামত দিলে তারা শুকরিয়া আদায় করে, আর মছিবত পৌছে গেলে তারা বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (নুযহা ১ম খন্ড- পৃষ্ঠা-৬৬)

মুমিনের গুণ হল ধৈর্য ধারণ করাঃ

যদি সত্যকারভাবে মুমিন হয়, অবশ্যই সে যে কোন মছিবতে ধৈর্য ধারণ করবে, কারণ তার এই ধৈর্যের উপর জান্নাত নিহিত রয়েছে- যেমন হাদিসে পাকের বাণী-

وعن ابی یحی صہیب بن سنان قال قال رسول ﷺ عجبا لامر المؤمن ان امره کله له خیر لیس ذلک لاحد الاالمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له
(مسلم مشکواة صف ۴۵۲)

রাসুল (দঃ) এরশাদ মুমিন বান্দা কতইনা সুন্দর, তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণের মাধ্যম, এগুলো শুধু ঈমানদারদের জন্য, যখন তাঁর কাছে কোন ভাল কিছ পৌছে, তখন শুকরিয়া আদায় করে, এটাই তাঁর জন্য কল্যাণ। আর যখন কোন মছিবত এসে পৌছে, তখন ধৈর্য ধারণ করে, এটাই তাঁর জন্য কল্যাণ। মোট কথা মোমিনদের প্রত্যেকটা কাজ কল্যাণময়। (মুসলিম, মিসকাত পৃষ্টা ৪৫২)

عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول الله ﷺ عجب للمؤمن ان اصابه خیر حمدالله وشکر وان اصابته مصیبة حمد الله وصبر فالمؤمن یوجر فی کل امره حتی فی اللقمة یرفعها الی فی امرئته
(بیہقی مشکواة صف ۱۵۱)

রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেন, মুমিন বান্দার জন্য ঐ কাজটা কতই সুন্দর, যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কল্যাণ পৌছে, আল্লাহর প্রসংশা ও শুকরিয়া আদায় করে, আর যখন কোন মছিবত পৌছে তখন ও আল্লাহ তায়ালার প্রসংশা ও ধৈর্য ধারণ করে। মুমিনের প্রত্যেকটি কাজে সাওয়াব রয়েছে এমন কি আপন স্ত্রীর মুখে এক গ্রাস খাওয়ার তুলে দিলেও সাওয়াব রয়েছে। [বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা-১৫১]

অধৈর্য হয়ে কান্নাকাটি করা এটা মুমিনের কাজ নয়, সে জন্য রাসুল (দঃ) যখনি অধৈর্য হয়ে ক্রন্দন করতে দেখলেই নিষেধ করতেন যেমন-

عن انس قال مر النبی ﷺ بامراة تبکی عند قبر فقال اتقی الله واصبری قالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انه النبی ﷺ فاتت باب النبی ﷺ فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفک فقال انما الصبر عند الصدمة الاولی
(بخاری مسلم مشکواة صف ۱۵۰)

হযরত আনাছ (রঃ) বলেন, রাসুল (দঃ) এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মহিলাটি কবরের কাছে গিয়ে কান্না করছিল, রাসুল (দঃ) তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, ধৈর্য ধারণ কর। মহিলাটি বলল, আমার কাছে যে মছিবত আসছে, তা আপনার কাছে আসেনি, মহিলাটি রাসুল (দঃ) কে চিনতে পারেনি, কেউ বলে দিল, নিশ্চয় তিনি রাসুল (দঃ)। সাথে সাথে মহিলাটি রাসুলের (দঃ) দরজায় উপস্থিত হয়ে গেল সেখানে কোন দারোয়ান পেল না এবং বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি আপনাকে চিনতে পারেনি।

রাসুল (দঃ) বললেন, নিশ্চয় অন্তরে কষ্ট পেলে, কোন মছিবত এসে গেলে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। [বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা-১৫০]

রাসুল (দঃ) মুছিবতে কান্না করতে দেখলেই বারণ করতেন আমাদেরও উচিত নবী (দঃ) যে কাজটা করতেন, তা অনুস্বরণ করা।

صبر এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হযরত বিশির হাফী (রঃ) বলেন,

الصبر الجميل هوالذى لاشكواى فيه الى الناس

(دلائل الخيرات صف ٢٩٣)

উত্তম ধৈর্য্য ধারণ হল, হাজারো কষ্ট ও মছিবতে থাকলেও মানুষের কাছে প্রকাশ না করে । [দলায়েলুল খাইরাত, ২৯৩]

صبر এর গুরুত্ব-

قال الامام جعفر الصادق الصبر من الايمان بمنزلة الراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد كذالك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان (اصول كافى صف ٤١)

ইমাম জাফর ছাদেক (রঃ) বলেন, ধৈর্য হল ঈমানের জন্য ঐ রকম গোটা শরীরের মধ্যে মাথা যে রকম। শরীরে যখন মাথা থাকবেনা, শরীরও থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে। মাথা থাকলেতো প্রাণ থাকবে, মাথা চলে গেলে প্রাণ চলে যাবে। শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক তদরূপ ধৈর্য থাকলে ঈমান থাকবে, ধৈর্য চলে গেলে ঈমান চলে যায়।

[উসুনে কাফি, পৃঃ ৪১]

মছিবতে ধৈর্যের উপকারঃ

রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন, কোন বান্দার কাছে কোন মছিবত চলে আসলে, এমন মছিবত যে কষ্ট দেয়, যেমন কোন মানুষের প্রিয় ছেলে মারা গেল, অধৈর্য না হয়ে, আওয়াজ করে কান্নাকাটি না করে, কাপড় চোপড়, ছিড়ে না ফেলে, বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বলে দেয়-

الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنى من مصيبتى واخلف لى خيرا منها

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তায়ালার, তার দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ আমাকে ধৈর্য ধারণ করার প্রতিদান দান কর এবং এই ছেলের চেয়েও উত্তম ছেলে আমাকে দান কর।

এইভাবে যখন বান্দা শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বলে দেখ আমি আমার এই বান্দার প্রিয় ছেলে নিয়ে ফেলেছি, সে অধৈর্য না হয়ে, আমার শুকরিয়া আদায় করছে, তোমরা তার প্রতিদান স্বরূপঃ

ابنو لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد

نزهة المجالس ج ١ صف ٦٨ احمد ترمذى مشكواة صف ١٥١

জান্নাতে ঘর বানা ও এবং সেই ঘরের নাম বাইতুল হামদ বা প্রশংসার ঘর রাখ।

(নুজহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড পৃষ্টা ৬৮, আহমদ, তিরমিযি, মিশকাত পৃষ্টা -১৫১

বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, এক আনসারী মহিলার ছেলে বদরে ময়দানে শহীদ হয়ে যায়, তিনি রাসুল (দঃ) এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি বলুনতো, আমার ছেলে যে শহীদ হয়ে গেছে, সে এখন জান্নাতে না কি দোযখে? যদি জান্নাতে হয় আমি ধৈর্য্য ধারণ করব এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করব, আর যদি সে জান্নাতে না যায় আমি অন্তর খোলে কাঁদব এবং মাতম করব।
রাসুল (দঃ) বললেন-

عليك الصبر والشكر

তোমার উচিৎ ধৈর্য ধারণ করা ও শুকরিয়া আদায় করা। কারণ, তোমার ছেলে জান্নাতুল ফেরদৌসে আরাম করছে। যে শহীদ হয়েছিলেন তার নাম হল হারেছ।
যেমন বুখারীর রেওয়াত মিশকাতে পাওয়া যায়।

عن انس ان الربيع بنت البراء ةهى ام حارثة بن سراقة اتت النبى ﷺ فقالت يارسول الله ﷺ الا تحدثنى عن حارثة

وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فان كان فى الجنة صبرت وان كان غير ذالك اجتهدت عليه البكاء فقال يام حارثة انها جنان فى الجنة وان ابنك اصاب الفردوس (بخارى مشكواة ٣٣١)

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে তার জন্য কান্নাকাটি আহজারী নয় বরং শুকরিয়া আদায় করার জন্য রাসুল (দঃ) শিক্ষা দিয়েছেন।

মছিবতে আহজারী করা মানে আমল বরবাদ করাঃ

মছিবতে ধৈর্য ধারণ না করে আহজারী করলে আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- হযরত জাফর ছাদেক (রঃ) রাসুল (দঃ) এর হাদিস নকল করেন-

قال رسول الله ﷺ ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة احباط لاجره (فروع كافى صف ١٢٢)

রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন মছিবতে পড়ে অধৈর্য হয়ে, মুসলমান যদি তার হাত রানের উপর মারে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়।

[ফুরোয়ে কাফি পৃঃ ১২২ খন্ড-১]

শাহাদত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বড় নেয়ামতঃ

উহুদের ময়দান থেকে আসার পথে রাসুল (দঃ) দেখতে পেলেন, হযরত আলী (রাঃ) পথে দাড়িয়ে চেহেরা মলিন করে আছেন। রাসুল (দঃ) জিজ্ঞাসা করলে হে আলী! তুমি এত চিন্তিত কেন? হযরত আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই যুদ্ধতে আপনার অনেক গোলাম শাহাদাতের জাম পান করে নিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আমীরে হামজা (রাঃ) হযরত মাছয়াব বিন ওমাইর (রাঃ) অন্যতম। আমি বড় পেরেশানীর মধ্যে আছি, আমি কেন জামেশাহাদাত পান করতে পারলাম না। রাসুল (দঃ) বললেন, হে আলী! অতি শীঘ্রই সময়টা চলে আসবে, যে দিন

তোমার মাথার মধ্যখানে তরবারী চলানো হবে, তোমার দাঁড়ি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে, তুমি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, ঐ সময় তোমার কাজ হবে ধৈর্য ধারণ করা। হযরত আলী (রঃ) শাহাদাতের শুভ সংবাদ শুনে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাত তুলে দিলেন, ফরিয়াদ জানালেন এবং রাসুল (দঃ) কে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

الصبر عند المصيبة والشكر للنعمة

মছিবতে ধৈর্য ও আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। নিশ্চয় শাহাদাত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বড় নেয়ামত।

হযরত আলী (রঃ) এর অছিয়তঃ

হযরত আলী যখন রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, "আব্দুর রহমান ইবনে মুলজম" নামক এক খারেজী মুনাফিক বিষ মিশানো ধারালো তরবারী দ্বারা হযরত আলী (রঃ) এর মাথা মোবারকে আঘাত করে দয়ে, গোটা শরীর রক্তে লাল হয়ে যায়, দাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া আরম্ভ করে, সাথে সাথে তিনি নবীজি (দ:) এর আগাম শুভসংবাদ স্বরণ করে শুকরিয়া আদায় করলেন, এবং দৃঢ় বিশ্বাস করে নিলেন, এখন শাহাদাতের সময় হয়ে গেল।

এবং আপন সন্তানদের ডেকে অছিয়ত করলেন, 'হে আমার আদরের সন্তানরা , আমার ইন্তেকালের পরে তোমাদেরকে এমন ধৈর্য ধারণ করতে হবে যেমনিভাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আপন আব্বা রহমতে দোআলম কে হারিয়ে। কোন ধরনের চিৎকার , আহজারী,হায় হায় করতে পারবে না। (মাদারজুন্ নাবুওয়াত)

দেখেন ভাইয়েরা হযরত মওলা আলী (র:) এর অছিয়ত কি? আর হযরত আলী (রাঃ) আশেক দাবী করে বর্তমানে শিয়া পন্থিরা মোহরম মাসে কি ধরনের ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয়।

দুঃখের বিষয় হল অনেক ছুন্নি মুসলমানরা ও শিয়াদের থেকে দেখে দেখে তাজিয়া মাতম করে থাকে যা শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

হযরত আলী(রঃ) এর শাহাদাতের কথা শুনে হযরত ইমাম হুসাইন(রঃ) এর অবস্থাঃ-

হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের সময় হযরত ইমাম হুসাইন মাদায়ন শহরে ছিলেন, আব্বাজানের কাছে ছিলেন না। আব্বার শাহাদাতের খবর পাঠাচ্ছেন বড় ভাইজান ইমাম হাসান(রাঃ) নিম্নে চিঠি ইবারত নকল করা হল-

لما اصيب اميرالمؤمنين صلوت الله عليه نعى الحسن الى الحسين عليه السلام وبو بالمدائن فلما قرا الحسين الكتاب قال يالها من مصيبة ما اعظمها مع ان رسول الله ﷺ قال من اصيب منكم من مصيبة فليذكر مصابة بى فانه لن يصاب بمصيبة اعظم منها وصدق ﷺ

(فروع كافى صف ۱۱۹ ج۱)

যখন আমীরুল মোমেনিন হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হয়ে যান, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কাছে চিঠি প্রেরণ করলেন এবং আব্বার শাহাদাতের কথা উল্লেখ করেন- যখন ইমাম হুসাইন (রাঃ)চিঠিটা পড়লেন তখন বললেন , এটা কত বড় মছিবত কিন্তু রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে কারো বড় মছিবত এসে গেলে আমার ইন্তেকালের কথা স্মরণ করবে, কারণ রাসূল (দঃ) এর ইন্তেকাল থেকে উম্মতের জন্য এর চেয়ে বড় মছিবত হতে পারে না।

অতঃপর ইমাম হুসাইন (রাঃ) ধৈর্য ধারণ করলেন। কোন ধরনের অধৈর্য্যতা দেখালেন না। (ফুরোয়ে কাফি পৃ:১১৯, খন্ড-১)

জান্নাতে গিয়েও শাহাদাতের কামনা

আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদেরকে জান্নাত দান করবেন, যে জান্নাতে কোন কিছুর অভাব থাকবে না, যেমন- কুরআনের বাণী

ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون

সেই জান্নাতে তোমাদের অন্তর যা চাইবে তা আল্লাহ তায়ালা দান করবেন এবং দুনিয়াতে থাকাকালিন জান্নাতে কি কি থাকবে যা তোমাদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল সব তোমরা পাবে। আল্লাহর বাণী থেকে স্পষ্ঠ হয়ে যায় সেই জান্নাতে কোন কিছুর অভাব থাকবে না কিন্তু একটি নেয়ামত সেই জান্নাতে কামনা করা সত্ত্বে ও পাওয়া যাবে না, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া। যেমন-

عن انس قال قال رسول الله ﷺ مامن احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله مافى الارض من شئ الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة (بخارى مشكواة صف ۳۳۰)

রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন , কোন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদি ও বা তাকে দুনিয়াতে যা আছে সব দেওয়া হয়, কিন্তু শহীদ যে দুনিয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূল (দঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে শহীদ হয়েছিল, সে চাইবে দুনিয়াতে ফিরে এসে বারংবার শহীদ হতে।এমন কি দশবার শহীদ হবার ইচ্ছা করবে, কারণ যে সম্মান জান্নাতে পেয়েছে সব শহীদ হওয়ার মাধ্যমেই। তাই সেই শাহাদাতের কামন জান্নাতে গিয়েও করবে, কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হবে না, কারণ জান্নাতে গেলে সেই জান্নাতই থেকে যেতে হবে দুনিয়াতে আসতে পারবে না, যেমন বারংবার আল্লাহতায়ালা কুরআন পাকে এরশাদ করেন- خالدين فيها ابدا সেই জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকবে।

শহীদের শারীরিক অবস্থাঃ-

আমরা মনে করি যিনি শহীদ হচ্ছেন , তার শরীরে কত আঘাত আর আঘাত কিন্তু রাসূল (দঃ) এর বাণীর মাধ্যমে বুঝা যায়, শরীরে সামান্য অনুভব হয়ে যেমন-

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ الشهيد لا يجد الم القتل الا كما يجد احدكم الم القرحة (ترمذى نسائ دارمى مشكواة صف ۳۳۳)

শহীদ শাহাদাতের সময় ঐ রকম ব্যাথা অনুভব করে, যেমনিভাবে তোমাদের কাউকে চিমটা বা পিপড়া কামড়ালে যে অনুভূতি হয়।

(তিরমিযি, নছায়ী, দারমী, মিশকাত পৃঃ-৩৩৩)

উল্লেখিত হাদিসে নববীর মাধ্যমে বুঝা গেল, আমরা দেখতে পাচ্ছি , যিনি শহীদ হচ্ছেন ,কাফের,বেঈমানরা তাদের গোটা শরীর তীর, নেজা, বললম, বন্দুক দিয়ে আঘাত করতে করতে রক্তার্ত্ব করে ফেলল, কিন্তু তার শরীরে পিপিলিকার কামড়ের মত অনুভব হল।

এই হাদিসের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে আমাদের কাছে স্পষ্ঠ হয়ে যায় ,ময়দানে কারবালায় ইমাম আলী মকাম (রাঃ) ও তার পরিবার, সঙ্গীরা যে মারাত্নক ও নির্মমভাবে শহীদ হলেন , গোটা ময়দান রক্তে রঞ্জিত হল। বাহিরগতভাবে দেখলে, লাগছে তাঁরা খুব কষ্ট পেয়েছেন , মূলত কোন ধরনের কষ্ট পান নি বরং আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের সাগরে ডুব দিয়েছিলেন। বিধায়তাদের জন্য আহজারী করা, মাতম করা অনর্থক বেফায়দা। আমাদের উচিত তাদের জীবনি থেকে শিক্ষা হাছিল করা ও গুনাবলি তুলে ধরে আমাদের জীবনের গুনাহ মুচন করা।

শহীদের উপর মাতম রাসূল(দঃ) নিজে করেননি এবং না করার অছিয়তঃ-

ইসলামের ইতিহাস পড়লেই স্পষ্ঠ হয়ে যায়, আমাদের নবী (দঃ) রুমিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মদিনা থেকে সৈন্য প্রেরণ করলেন, রুমিদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ এবং মুসলিম সৈন্য হল প্রায় ত্রিশ হাজার মাএ। রাসূল (দঃ) মদিনা থেকে নিদিষ্ট করে দিলেন কে কে সেনাপতি হবেন, রাসূল তিনজনের নাম উল্লেখ করেন যথক্রমে-

(১) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রঃ)
(২) হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রঃ)
(৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রঃ)

দখা যায় যুদ্ধের ময়দানে তিনজনই একের পর এক বীরত্ব দেখিয়ে শহীদ হয়ে যান।এদিকে মদিনা রাসূল (দঃ) সব দেখতে পান এবং আপন সাহাবীগণ যারা যুদ্ধে যাননি তাদেরকে উল্লেখিত সেনাপ্রধানগণের শাহাদাতের শুভ সংবাদ শুনিয়ে দেন। তিনি আপন চাচাতভাই জাফর তইয়ার (রাঃ) পরিবারে গিয়ে ধৈর্যের তালিম দেন। হযরত জাফর বিন আবু তালিবের স্ত্রী ছিলেন আসমা বিনতে ওমাইছ (রাঃ)।

রাসুল (দঃ) যখন তাঁকে আপন স্বামীর শাহাদাতের খবর দেন, হঠাৎ তিনি চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলেন। এই কান্না শুনে অনেক মহিলা একত্রিত হয়ে যায়। সাথে সাথে রাসূল (দঃ) তাকে আদেশ দেন-

يااسماء لا تقولى ہجرا ولا تضربى خدا

হে আসমা অধৈর্য হয়ে অনর্থক কথা বল না এবং নিজের মুখে থাপ্পড় মের না। অতঃপর রাসূল(দঃ) জাফর (রাঃ) এর জন্য দোয়া করলেন-

اللہم قدمه يعنى جعفر الى احسن الثواب واخلفه فى ذريته باحسن ما خلفته احدا من عبادك فى ذريته

(السير النبوية لابن زينى دحلان ج ٢ صف ٣٢١)

হে আল্লাহ জাফর(রাঃ)কে উত্তম সাওয়াব দান কর। এবং তার ছেলে সন্তানদের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করে দাও। যেমনি ভাবে তোমার বান্দাদের সম্মানের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি কর।

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল , রাসূল (দঃ) নিজেও মাতম করেননি এবং তার চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীকে মাতম না করার আদেশ দেন। শুধু মাত্র চোখের পানি ফেলে কান্না করার মাধ্যমে যথেষ্ট করে নিয়েছেন। এ ভাবে চোখের পানি ফেলে কান্না করার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। হ্যাঁ বড় আওয়াজ আহাজারী করে মাতম করা রাসূল(দঃ)জায়েজ দেন নি।

হযরত মা ফাতেমা (রঃ) এর প্রতি রাসূল (দঃ) এর অছিয়তঃ-

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অসংখ্য কিতাবের মধ্যে মাতম হারামের উপর আলোচনা রয়েছে, কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ীরা এই মাতমকে অনেক বড় ইবাদত মনে করে অথচ তাদের মুরুব্বীরা কিতাবে কি লেখেছে তারা সেগুলো পড়ে না। তাদের মাজহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'ফুরুয়ে কাফি ও জালাউল উয়ুন' কিতাবে রাসূল (দঃ) এর অছিয়ত যা রাসুল (দঃ) ইন্তেকালের পূর্বে আপন মেয়ে মা ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) কে করেছিলেন-

اوصى النبى ﷺ لفاطمة عند الوفات وقال عليه
الصلوة والسلام اذا انا مت فلا تخمشى على وجها
ولا ترخى شعرا ولا تنا دى بالويل ولا تقيمى على نائحة
(جلاء العيون صف ۴۴= ۴۷ فروع كافى ج۲ صف ۲۲۸)

নবী করিম (দঃ) ইন্তেকালের পূর্বে হযরত ফাতেমা (রঃ) কে ডেকে অছিয়ত করেন, হে আমার কলিজার টুকরা! আমি যখন পর্দা করব, তুমি তোমার চেহরায় আহজারী করে মারিও না, মাথার চুল খোলে কান্নাকাটি করিওনা, হায় হায় করে চিৎকার করিওনা এবং আমার উপর ক্রন্দনকারী মহিলা দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করার সুযোগ দিও না।

(জালাউল উয়ুন খন্ড-১, পৃষ্ঠ ৪৪-৪৭, ফুরুয়ে কাফি, ২ খন্ড, পৃষ্ঠ ২২৮)

হযরত ফাতিমা (রাঃ) আপন আব্বার অছিয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল করেছিলেন, তিনি রাসুল (দঃ) এর ইন্তেকালে নিজে মাতম করেছিলেন নাকি অন্যজনকে করার সুযোগ দিয়েছিলেন? হ্যাঁ পৃথিবীর জমিনে যারা বেশী ক্রন্দন করেছিলেন আওয়াজ ছাড়া তারা বিশেষ করে চার জন। (১) হযরত নুহ (আঃ) (২) হযরত আইয়ুব (আঃ) (৩) হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসুলের (দঃ) ইন্তেকালে (৪) হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) ময়দানে কারবালা থেকে ফিরে এসে, উনারা কেঁদেছিলেন এমন ক্রন্দন যার মধ্যে আওয়াজ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায়ীরা আওলাদ রাসুল (দঃ) এর বানাউট মুহব্বতে এমন ভাবে কাঁদে, যার মধ্যে শব্দ হয়ে যায়, নিজে কাঁদে অপরকে কাঁদায় এবং নিজের শরীরের উপর ও আঘাত করে থাকে, যা শরীয়তে মুহাম্মদী (দঃ) এর পুরা বিপরীত।

রাসুল (দঃ) এর ইন্তেকালে হযরত আলী (রঃ) এর অবস্থাঃ

শিয়া সম্প্রদায়ীদের অন্যতম কিতাব "নাহজুল বালাগাহ" নামক কিতাবে হযরত আলী (রঃ) এর এরশাদ নকল করেন-

ومن كلامه عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول الله
ﷺ وتجهيزه بابى انت وامى قد انقطع بموتك مالم ينقطع
بموت غيرك من النبوه والانباء بالغيب والاخبار السماء

خصصت حتى صرت مسلبا عن سواك وغمت حتى
صار الناس فيك سواء لولا انك امرت بالصبر وفنهيت
عن الجزع لا نفد نا عليك ماء الشؤن
(نهج البلاغة صف ۱۹۳=۳۳۸ مطبوعه تهران)

হযরত রাসুল করিম (দঃ) এর ইন্তেকালে হযরত আলী (রাঃ) রাসুলের (দঃ) গোসল ও কাপন পড়ানোর শেষে যা বলেছিলেন তা হল, ইয়ারাসুলাল্লাহ (দঃ) আমার আব্বা-আম্মা আপনার কদমে কুরবান, আপনার ইন্তেকালে এমন কিছু বন্ধ হয়ে গেছে, যা অন্য নবীদের ইন্তেকালে বন্ধ হয়নি। আপনার ইন্তেকালে নবুয়তের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে, আসমান থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা গায়েবের খবর এসেছিল তা, বন্ধ হয়ে গেছে, ফাজায়েল, সম্মান আপনার জন্য যা নির্দিষ্ট ছিল, অন্যের থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপনাকে সম্মানের তাজ পরিধান করানো হয়েছে।

আপনি ছাড়া সবাই উম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে বরাবর, আপনার পর কোন নবী নেই। আপনি যদি ধৈর্য ধারণ ও আহাজারী না করার আদেশ না দিতেন, তাহলে আমি আপনার ইন্তেকালে ক্রন্দন করতে করতে চোখের সব পানি শেষ করে দিতাম।

(নাহজুল বালাগাহ পৃষ্ঠা- ১৯৩, ৩৩৮)

হযরত আলী (রঃ) এর এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ঠ হয়ে যায়, রাসুল (দঃ) মাতম করা থেকে উম্মতকে নিষেধ করেছেন এবং মছিবতে ধৈর্য ধারণ করার হুকুম দান করেন।

এভাবে **"জালাউন উয়ুন"** কিতাবে রাসুল (দঃ) এর ঐ অছিয়ত কে নকল করেন যা মা ফাতেমাকে করেছিলেন-

بداں اے فاطمہ مہ برائ پیغمبر گریباں نمی باید دریدرونمی باید خراشیدواویلا
نمی باید گفت ولکن بگوانچہ پدرتو دروفات ابراہیم فرزندخود گفت کہ چشمان می
گیریند ودل بدادے دے می ایدونمی گویم چیزی کہ موجب غضب پروردگارشد
(جلاء العیون ج ا صف ۵۸)

রাসুল (দঃ) কলিজার টুকরা ফাতেমা (রঃ) কে ইন্তেকালের পূর্বে অছিয়ত করেন, হে ফাতেমা! আমার ইন্তেকালে ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিও না, আপন চেহরার উপর মারিও না, আহজারী করে হায় হায় করিও না, বরং এই মছিবতে ঐ রকম ধৈর্য ধারণ করবে যেমনিভাবে আমার কলিজার টুকরা হযরত ইব্রাহীম (রঃ) এর ইন্তেকালে করেছিলেন, আমার চোখে পানি প্রবাহিত হয়েছিল, অন্তর পেরেশান হয়েছিল কিন্তু আওয়াজ করে কান্না করেনি, কারণ আহাজারী করা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মাধ্যম। (জালাউল উয়ুন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৫৮)

শিয়াদের এই কিতাবের বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা গেল মাতম করা যাবে না, চোখের পানি ফেলা যাবে।

মহিলাদেরকে বায়াত করার পূর্বে রাসুল (দঃ) এর আদেশঃ

আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব (দঃ) কে মহিলাদের বায়াত করার পূর্বে কি শর্তে দেবেন, তার পরামর্শ দান করেন যা সুরা মুমতাহিনার ১২নং আয়াতে রয়েছে-

يايها النبى اذا جاء ك المؤمنت يبايعنک على ان لا
يشر كن بالله شينا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن
اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن
ولا يعصينک فى معروف فبا يعهن واستغفر لهن الله
ان الله غفور رحيم (سورة ممتحنة)

হে রাসুল (দঃ) আপনার কাছে কোন মুমিন মহিলা বায়াত গ্রহণের জন্য আসলে, তাদেরকে একথার উপর বায়াত করান, তারা যাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, চুরি না করে, ব্যভিচার না করে, আপন সন্তানকে হত্যা না করে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেয়, হাত পায়ের মধ্যখানের স্থানের ব্যাপারে, ভাল কাজে নাফরমানী না করে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু- (সুরা মুমতাহিনাহ)

উল্লেখিত আয়াতে لا يعصينک এর তাফসিরে শিয়া সম্প্রদায়ের আলেম নকল করেন। হযরত উম্মুল হাকিম বিনতে হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসুল

(দঃ) থেকে معروف সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যেমন-

ما بذالمعروف الذى امرنا الله ان لا نعصيک فيه فقال
ﷺ ان لا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا
ولا تمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور
ولا تقمن عند قبر فبايعن رسول الله ﷺ
(فروع كافى ج٢ صف ٢٢٨ تفسير قمى صف ٣٣٥
تفسير مجمع البيان ج٩ صف ٢٧٦ كتاب العلل والشرائع
ج٢ صف ١١٠)

রাসুল (দঃ) বলেন, তোমরা মছিবতের সময় চেহরাতে মারিওনা, গালে থাপড় দিওনা, মাথার চুলকে খোলে দিওনা, কাপড়ের পকেটকে ছিড়িওনা, কাপড়কে কাল করিওনা, হায় হায় করে চিৎকার করিওনা, করবে দাড়িয়ে কান্না করিওনা, অতঃপর রাসুল (দঃ) উল্লেখিত শর্তের উপর তাদের বায়াত করান। (ফুরুয়ে কাফি খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২২৮, তাফসিরে কুমি পৃষ্ঠা- ৩৩৫, তাফসিরে মজমাউল বায়ান ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৭৬, কিতাবুল ইলালওয়াশ শারায়ে ২য় খন্ড- ১১০)

মাতম ও তাজিয়া নাজায়েজ হওয়ার জন্য উল্লেখিত বর্ণনার চেয়ে অধিক বর্ণনার প্রয়োজন মনে করি না।

ইমাম জাফর ছাদেক(রঃ) রাসুল(দঃ) থেকে বর্ণণা করেন-

نهى رسول الله ﷺ عن الرنة عند المصيبة ونهى
عن النياحة والاستماع اليها
(من لا يحضره الفقه ج٢ صف ٣٥١ كتاب الامالى صف ٢٥٢)

মছিবতে পড়ে বড় আওয়াজে কান্না করা থেকে রাসুল (দঃ) নিষেধ করেছে , এবং মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির জন্য বড় আওয়াজে কন্দন করা ও ঐ কন্দন শুনতেও নিষেধ করেছেন। (মান না ইয়াহদুরুহুল ফিকহ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫৬, কিতাবুল আমালী পৃষ্ঠা ২৫৪)

মাতম করা জাহেলী যুগের কাজ

মানুষ মারা গেলে বা কেউ শহীদ হলে মাতম করা , চিৎকার করে কান্না করা জাহেলী যুগের রছম ছিল। যার কারণে রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন

اثنان فى الناس بهما كفر الطعن فى النسب
والنياحة على الميت

মানুষের মধ্যে দুটি কাজ কুফরী (১) বংশ নিয়ে গালাগালি করা, (২) মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্না করা।
এই দুটি কাজ জাহেলী যুগে বেশী ছিল । আর এই কাজগুলি হারাম , যার কারণে রাসুল (দঃ) আপন উম্মতকে নিষেধ করেছেন।

ততকালীন আরবীদের ঐতিহ্য ছিল কোন মানুষ মারা গেলে তার জন্য মাতম করা, মাসের পর মাস সুখ পালন করা এবং তাদের বিচ্ছেদের কবিতা পাঠ করে করে অপরজনকে উচ্চস্বরে কান্না করানো। আবার অনেকে অছিয়ত করে যেতে , মারা যাওয়ার পর তার জন্য মাতম করা এবং সুখ পালন করা, তাদের মধ্যে কবিদের রাজা ইমরুউল কাইস অন্যতম।

তাঁর মৃত্যুর সময় যখন কাছে চলে আসে, তার কন্যাদের অছিয়ত করে যায় । আমি মারা যাওয়ার পর কবরের উপর তাবু বানাবে, এক বছর পর্যন্ত আমার শানে কবিতা পাঠ করে করে, তোমরা কান্নাকাটি করিও, এবং মাতম করিও, তার ইন্তেকালের পর উছিয়ত অনুযায়ী এক বছর পর্যন্ত মাতম করা হয়েছিল। (তফসিরে বয়যাভী)

জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধ কবি খুনাসার ঘটনাঃ-

খুনাসা নামক আরবী প্রসিদ্ধ কবি ছিল, তার ভাই বড় বীর ছিল, একদিন যখন ভাইকে হত্যা করা হয়, ভাইয়ের বিচ্ছেদে কবিতা রচনা করে এবং সবার সামনে পাঠ করত। সে নিজে কন্দন করত এবং অন্যকেও কাঁদাত , এভাবে ভাইয়ের বিচ্ছেদে কান্দন করতে করতে তার চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে যায়। এমনকি অন্ধ হয়ে যায়। আর যখন ইসলামের নূরানী কিরণ তার অন্তর আলোকিত করল, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, তাঁর অন্তরে রাসুল (দঃ) এর মুহব্বতে ভরপূর হয়ে যায়, তার কামনা ছিল কিভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তার তিনজন ছেলে সন্তান ছিল। একদিন শুনতে পেল মুসলিম বাহিনী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাদেসীয়ায় আসে। ঐ মহিলা তার যুবক ছেলেদের নিয়ে সেনাপতির কাছ চলে আসেন এবং আরজ করেরেন, ইসলামের পতাকা উড্ডিনের জন্য আমি আমার তিন ছেলেকে বখশিশ করলাম, সেনাপতি ঐ ছেলেদের গ্রহণ করে নিলেন।

আর তিনি আপন ছেলেদের ডেকে বললেন, হে আমার আদরের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুল (দঃ) সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করছি। তোমরা আন্তরিকভাবে জিহাদ করবে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে না। তিনি তাদের থেকে মজবুত ওয়াদা নিলেন এবং সন্তানরা তাকে ওয়াদা দিলেন। তারা যখন ময়দানে যায়, তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালেন হে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানদের শহীদ হওয়ার তৌফিক দাও, আমাকে শহীদের আম্মা বানাও, তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও, এদিকে তিন ছেলে বাহাদুরী দেখিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করে, অবশেষে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে নিল। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, মুসলমানদের বিজয় হয়। এই মহিলা ধীরে ধীরে ময়দানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলেদের অবস্থা কি? তারা উত্তরে বললেন, তারা তিনজনই শহীদ হয়ে গেছেন। মা কোন ধরনের উচ্চঃস্বরে কান্না করলেন না। যে মহিলা ভাইয়ের বিচ্ছেদে কানতে কানতে চুক্ষ পর্যন্ত হারালেন, আজ ঐ মহিলা আপন ছেলেদের শহীদের কথা শুনে শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, আপনারা আমার ছেলেদের লাশের পাশে নিয়ে যায়, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখি। তারা ঐ মহিলাকে তাঁর ছেলেদের লাশের পাশে নিয়ে গেলেন, ঐ মহিলা তাদের শরীরের উপর হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে আঘাত পিছনে বেশী নাকি সামনে বেশী? যদি পালাবার সময় মারা যায়, নিশ্চয় পিছনে আঘাত পাবে। আর যুদ্ধ করে মারা গেলে নিশ্চয় সামনে আঘাত বেশী হবে। আসলেই দেখতে পেলেন, তাদের বুকের দিকেই সব আঘাত, পিছনে তেমন আঘাত নেই, উনি সাথে সাথে শুকরিয়া স্বরূপ বলতে লাগেন-

الحمد لله الذى شرفنى بشهادة ہؤلاء

সমস্ত প্রসংশা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তাদের শাহাদাত দিয়ে আমাকে সৌভাগ্যশালী করে নিলেন। তিনি চোখের পানি ফেলাবার মাধ্যমে সুখ পালন করলে, মাতম ও উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা ছেড়ে দিলেন, কারণ এটাতো কান্না করার বিষয় নয়, বরং শুকরিয়ার বিষয়। আজ যারা ময়দানে কারবালার স্বরণে মাতম করে, তাজিয়া বের করে, তাদের এই মহিলা থেকে শিক্ষা হাসিল করার দরকার আছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন নিশ্চয় তারা নেয়ামতের ডিপুতে পৌছে গেছেন, তাদের জন্য মাতম করা উচ্চস্বরে কান্না করা ফায়েদা বিহীন কাজ।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) আপন সন্তানদের প্রতি নসিহতঃ

হযরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) যিনি মিশর বিজয় করেছিলেন, ইন্তেকালের পূর্বে বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন, শুয়ে শুয়ে শুধু চিন্তাতে মগ্ন থাকেন কিছুক্ষণ এই পার্শ্বে ফিরে আর কিছুক্ষণ অপর পাশে, এই অবস্থা দেখে ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলেন- আব্বা আপনি অত পেরেশানে কেন? রাসুল (দঃ) ও ইসলামের অছিলায় আপনার পূর্বের ও পরের গুনাহ সবতো ক্ষমা। তিনি উত্তরে বললেন, হে আমার ছেলেরা শোন। আমার জীবনের তিনটি অংশ রয়েছে- ১ম অংশ আমি সম্পূর্ণ কুফরীতে ছিলাম ঐ অবস্থায় মারা গেলে আমার জাহান্নাম ছাড়া উপায় ছিল না। ২য় অংশ সেই সময় আমি রাসুল (দঃ) এর হাতে হাত দিয়েছিলাম এবং রাসুলের ছোহবত পেয়েছিলাম, ঐ সময় মারা গেলে, অবশ্যই আমার ঠিকানা জান্নাত হত। আর ৩য় অংশ হল, যেই অবস্থায় এখন আমি আছি, এই অবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। আমি তোমাদের কিছু অছিয়ত করছি, আমি মারা গেলে সেই মোতাবেক তোমরা কাজ করবে-

وقال لابنه وهو فى سياق الموت اذانامت فلا تصحبن نائحة ولا نارا واذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا ثم اقيموا حول قبرى قدر ماينحر جزورا ويقسم لحمها حتى استانس بكم واعلم ماذا اراجع برسل ربى (مسلم مشكواة)

আমি যখন মারা যাব, তোমরা কান্না করার জন্য এ রকম মহিলা ঠিক করবে না, আগুন জালাবেনা, আর যখন আমাকে দাফন করবে, আমার উপর ভালভাবে মাটি ঢেলে দিবে, আমার কবরের উপর ততক্ষণ অপেক্ষা করবে, যেই সময় কুরবানীর পশু জবেহ করে তার মাংস বন্টন করা যায়। তোমাদের উপস্থিতিতে আমার প্রশান্তি হাসিল হবে এবং আমি জানতে পারব আল্লাহ তায়ালার ফেরেস্তা মুনকির নকিরের প্রশ্নে কি উত্তর দিচ্ছি। (মুসলিম, মিশকাত)

উল্লেখিত হাদিসে হযরত আমর ইবনে আস (রঃ) ছেলেদের কে মাতম করা থেকে নিষেধ করেছেন, কারণ সেই সময় মাতমের পরিবেশ ছিল। মাতম করা শুধু হারাম নয় বরং যারা মাতম করে তাদের ব্যাপারে রাসুল (দঃ) এর ফরমান-

من لطم الخدود وضرب الصدور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا (مسلم بخارى مشكواة صف ١٥٠)

যে মছিবতে পড়ে আপন গালে থাপড় মারে, সিনার বা বক্ষের উপর হাত মারে, কাপড়ের পকেট ছিড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় হায় হায় করে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

(মুসলি বুখারী, মিশকাত-১৫০)

যারা মাতম করে নিশ্চয় তারা শরিয়তকে অমান্য করে, রাসুল (দঃ) বলে এই মাতম আমার উম্মতের কাজ নয়।

সর্বপ্রথম মাতম কে করেছে?

ইমাম আলী মকাম হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) ও তাঁর পরিবারকে শহীদ করার পর সর্বপ্রথম মাতম করেছিল ইয়াজীদিরা। ইমামের পরিবারে শুধু বেচে ছিলেন অসুস্থ জয়নুল আবেদীন (রাঃ) ও মহিলারা। তাদের নিয়ে ইয়াজীদিরা কুফাতে যখন আসে কুফাবাসীরা উচ্চস্বরে কান্না করতে শুরু করে। হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) তাবু থেকে মাথা মুবারক বের করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এভাবে কান্না করছ কেন? তোমরা কার মাতম করছ? তারা উত্তরে বলে, আমরা আপনার মছিবতে মাতম করছি। আপনার পরিবারের মুহব্বতে মাতম করছি।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) তাদেরকে বললেন, হে কুফাবাসী তোমরা আমার মছিবতে মাতম করছ, একটু বলত আমাদের পরিবারকে এভাবে শহীদ কারা করেছে? যেমন আখবারে মাতমের লিখকে নকল করেন-

فجعل اهل الكوفة يفرحون ويبكون حتى اطلع على بن حسين رضى الله عنه راسه وقال بصوت ضئيل اتبكون من حبنا فمن ذا الذى قتلنا (اخبار ماتم صف ٨٠٢)

অর্থাৎ ইমাম আলী বিন হুসাইন (রঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাদের মুহাব্বতে কান্না করছ, বলত আমাদেরকে কে শহীদ করেছে? (আখবারে মাতম পৃষ্ঠা-৮০২)

এভাবে সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম বিনতে হুসাইন (রঃ) এর বাণী-

ان ام كلثوم اطلعت راسها من المحمل وقالت لهم
ياهل الكوفة يقتلنا رجالكم وتبكى نساءكم فالحاكم
بيننا وبينكم الله يوم الفصل للقفايا (اخبار ماتم صف ٨١٨)

হযরত উম্মে কুলসুম যিনি ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর আদরের কন্যা ছিলেন, উনি কুফাবাসীদের মাতম দেখে বলে উঠলেন, তোমাদের পুরুষরা আমাদের শহীদ করেছে, আর মহিলারা কান্না করছে। তোমাদের ও আমাদের মধ্যখানে ফয়সালা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা করবেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার উপর ছেড়ে দিলাম।

(আখবারে মাতম, পৃষ্ঠা ৮১৮)

উল্লেখিত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়, নবী (দঃ) এর পরিবার এই মাতমকে কিভাবে ঘৃণা করেছিলেন, শুধু তাই না, ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর বোন সৈয়্যদা জয়নব (রাঃ) যিনি আপন দুই ছেলে মুহাম্মদ ও অউন (রাঃ) কে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কাছে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন, উনি তাঁদের এই শরীয়ত বিরোধী মাতম দেখে তাদের কাছে একটা খুৎবা দিলেন এবং বলেন-

ياهل الكوفة اتبكون وتنوحون اى والله فابكوا
كثيرا واضحكوا قليلا (اخبار ماتم صف ٨٠٥)

হে কুফাবাসী! তোমরা আমাদের জন্য কান্না করছ? আমাদের মছিবতে মাতম করছ? খোদার শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা বেশী ক্রন্দন করবে, কম হাসতে পারবে, হযরত বিবি জয়নব (রাঃ) এর বাণী বর্তমানে আমরা দেখতে পারছি কুফার অবস্থা, ইতিপূর্বে তারা কান্নায় ছিল এখনও বিভিন্ন মছিবতে বিশেষ করে মার্কিনী হামলায় তারা কান্নায় রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত কান্নার মাতমে থাকবে।

ইয়াজীদের ঘরে মাতমঃ

এভাবে শামবাসী ও কুফাবাসীর মত তাদের কৃত কর্ম থেকে দূর্নাম মিটাবার জন্য এই মাতম করেছিল। যখন ইমামের পরিবার কে ইয়াজীদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইয়াজিদ পূর্ব থেকে তার পরিবার পরিজনকে আদেশ দিয়ে দেয়, যখনি ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর পরিবার আমার ঘরে নিয়ে আসা হবে, তোমরা তাদের প্রতি দরদ দেখাবে।

সুখ প্রকাশ করবে এবং উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে মাতম করবে এবং তিন দিন পর্যন্ত এই মাতম জারি রাখবে। দেখা যায় আসলে তারা এই মাতম করেছিল, এই মাতম দরদ দেখিয়ে নয় বরং তাদের উপর থেকে দূর্নামের বুঝা ফেলে দেওয়ার জন্য। (আখবারে মাতম পৃষ্ঠ- ৯৬৮, তারিখে তবরী পৃষ্ঠ- ৩০৬, জালাউল উয়ুন ২য় খন্ড পৃষ্ঠাঃ ২৪৫)

বুঝা গেল এই মাতম করেছিল ইয়াজীদিরা, আজ আমরা ইমাম হুসাইনের (রাঃ) মুহাব্বতের দাবিদার হয়ে কিভাবে মাতম, তাজিয়া বের করতে পারি? যেটা শরিয়ত জায়েজ রাখে নাই। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে মাতম এটা জাহেলী প্রথা রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেন, আমার উম্মত জাহেলী যুগের চারটি কাজ করেই যাবে তারা ঐ কাজগুলা ছাড়বেনা। তার মধ্যে একটা হল মাতম করা। যেমন-

عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله ﷺ اربع
فى امتى من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر فى
الاحساب والطعن فى الانساب والاستقاء با لنجوم
والنياحة وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
(مسلم ج ١ صف ٣٠٣ مشكواة صف ١٥٠)

হযরত আবু মালেক আল আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মত জাহেলী যুগের চারটি কাজ ছাড়বে না। (১) বংশ নিয়ে গৌরভ করা (২) বংশ নিয়ে গালাগালি করা (৩) বৃষ্টি বর্ষণের প্রভাব তারকার দিকে করে দেওয়া অর্থাৎ তারকাই বৃষ্টি বর্ষণ করে বলবে (৪) মারা গেলে মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা। যারা মাতম করে, তারা কবর থেকে কিয়ামতের ময়দানে উঠবে আলকাতরা লাগানো কাপড় পরে এবং বর্ম হবে মরিচা যুক্ত। [মুসলিম ১ম খন্ড-৩০৩; মিশকাত ১৫০]

রাসুল (দঃ) এর হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মানুষ মাতম ছাড়বে না, যদিওবা শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, সাধারণ মানুষ রাস্তা ঘাটে, পানিতে ডুবে মারা গেলে তার আত্মীয়রা মাতম করে থাকে, তারা অধৈর্য হয়ে যায়, আহাজারী করে, আহাজারী অবস্থায় পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখা যায়, কিন্তু দরকার ছিল তাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া,

আহাজারী করা থেকে বারণ করা, যেমন বারণ করতে আদেশ দিয়েছিল রাসুল (দঃ) আপন সাহাবাদের-

عن عانشة قالت لما جاء النبى ﷺ قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وانا انظرمن صائر الباب يعنى شق الباب فاتاة رجل فقال ان نساء جعفر و ذكر بكاء هن فامره ان ينهن فذهب ثم اتاه الثانية لم يطعنه فقال انهن فاتاه الثالثة قال والله علينا يارسول الله فزعمت انه قال فاحسست فى افواهن التراب فقلت ارغم الله انفك لم تفعل ماامرك رسول الله ﷺ ولم تترك رسول الله ﷺ فى العناء (بخارى مسلم صف ٣٠٢ مشكوة صف ١٥٢)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, যখন রাসুল (দঃ) এর কাছে মুতার যুদ্ধ থেকে খবর আসল, হযরত ইবনে হারেসা, হযরত জাফর ও হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন, রাসুল (দঃ) বসা ছিলেন, আর চেহরাতে পেরেশানির আলামত জাহের হয়ে যায়, আর আমি ভিতর থেকে দরজার পটক দিয়ে রাসুল (দঃ) কে দেখতে থাকি, অতঃপর রাসুল (দঃ) এর কাছে একজন মানুষ এসে খবর দিলেন, হযরত জাফর (রাঃ) এর মহিলারা মাতম করছে, রাসুল (দঃ) তাকে হুকুম করলেন, যাও তাদেরকে মাতম করা থেকে নিষেধ করে আস। ঐ মানুষটা গেলেন এবং তাদেরকে নিষেধ করলেন, কিন্তু তার কথা শুনল না তারা মাতম করতেই থাকে। মানুষটা আবার এসে বললেন, হুজুর তারা আমার কথা শুনছে না, রাসুল (দঃ) পূনরায় বললেন, যাও তাদেরকে নিষেধ করে আস। তিনি গেলেন নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা শুনলনা মাতম করতেই থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলের (দঃ) অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম রাসুল (দঃ) ঐ ব্যক্তি হুকুম করছেন, তাদের মুখে বালি মেরে হলেও বারণ কর, আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম আপনার নাক ধূলিবালি হোক রাসুল (দঃ) আপনাকে যা হুকুম করছেন, আপনি পালন করছেন না কেন? কেন আপনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করছেন না? আপনার উচিত তাদের মুখে বালি মেরে হলেও তাদেরকে মাতম থেকে বারণ করা। [বুখারী, মুসলিম পৃষ্ঠা-৩০৩, মিশকাত পৃষ্ঠা-১৫২]

দেখেন হযরত জাফর তুইয়ার (রাঃ) শাহাদতের পর তার আত্মীয়রা মাতম বা উচ্চস্বরে কান্না করে। রাসুল (দঃ) নিষেধ করেছেন, কারণ মাতম করা জায়েয নেয় এবং হযরত জাফর তো ধবংশ হয়নি বরং আল্লাহর নেয়ামতের সাগরে সাঁতার কাটছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে নূরানী ডানা ও দিয়েছিলেন, তার হাত দুটি কাফেররা কেটে দিয়েছিল বিধায়। তিনি ঐ ডানা দ্বারা উড়ে উড়ে জান্নাতে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্য এভাবে মাতম করার কি প্রয়োজন রয়েছে? ঠিক তদরূপ ময়দানে কারবালায় সবাইতো ইমাম আলী মকামের (রাঃ) প্রেমে শহীদ হয়ে জান্নাতের মালিক হয়ে যান, তাদের জন্য মাতম করা, উচ্চস্বরে কান্না করার কি প্রয়োজন? আর জেনে শুনে ইচ্ছা করে নিজের শরীরের উপর চুরি ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা হারাম ও বড় গুনা, এই কাজ করে ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও তার পরিবারের জন্য কান্না করাতে কোন সাওয়াব নেয় বরং ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন, কেননা তারা তাঁর নানা জানের নিষেধকৃত কাজ করে তার প্রতি ভক্তি দেখাচ্ছে, নিশ্চয় এই ভক্তিটা বানাউট ও লোক দেখানো। আল্লাহ তায়ালা সুন্নী মুসলমানকে এই বানউট কাজ থেকে হেফাজত করুক। আমিন।

উল্লেখিত ব্যাপক দলিল থেকে আমাদের কাছে সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, মাতম করাটা সম্পূর্ণ রুপে অবৈধ ও গুনাহের কাজ। আমাদের কাজ হবে, সেই কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। কারণ আল্লাহ তায়ালা যেমনি ভাবে আমাদেরকে অন্য উম্মতের উপর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, ঠিক একটা দায়িত্ব ও দিয়েছেন, তা হল ভাল কাজে মানুষকে আদেশ করা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদের কাজ ভাল কাজে মানুষকে আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।
আশা রাখি ক্ষুদ্র এই কিতাবখানা পড়ে নিজে আমল করবেন এবং ভাই বোনদেরকে মাতম করা থেকে বিরত রাখবেন, আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আমিন।

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতে দৃষ্টিতে তাজিয়াঃ

তাজিয়া বলতে মহুরমের দশ তারিখ শোহদায়ে কারবালার স্বরণে মিছিল বের করা, যেখানে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর মাজার এর নকশা বানানো হয়, গোড়া, মানুষ, তরবারী দিয়ে যুদ্ধার নকশা বানানো হয় এবং ঢোল বাজিয়ে মরসিয়া পড়ে। আর সবাই হায় হায় করে কান্না কাটি করে এবং নিজের শরীরের উপর চুরি বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্ত বের করে। এই তাজিয়া শরীয়তে কতটুক জায়েয রয়েছে? সে ব্যাপারে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ফাতাওয়া নিম্নে পেশ করা হল।

হযরত আব্দুল আজীজ মুহাদ্দীছে দেহলভী (রঃ) এর ফতোওয়াঃ

হযরত আব্দুল আজীজ মুহাদ্দীছে দেহলভী ফার্সী ভাষায় যে ফতোয়া লিখেছিলেন তার ইবারত-

تعزیہ داری درعشرہ محرم وساختن ضرائح وصورت وغیرہ درست نیست

(فتاوی عزیزیہ ج ا صف ۷۵)

মুহরমের দশ তারিখ যে তাজিয়া বের করা হয় এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর মাজার শরীফের নকশা ও ইত্যাদি বানানো হয়, তা জায়েয নাই। (ফতোয়ায়ে আজিজিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৫)

تعزیہ داری کہ ہمچو مبتدعان می کنند بدعت ست وہمچنین ساختن ضرائح وصورت قبور وعلم وغیرہ این ہم بدعت ست وظاہرست کہ بدعت سیئہ است

(فتاوی عزیزیہ ج ا صف ۷۵)

বদমাজহাব তথা শিয়ারা যে তাজিয়া বের করে তা বেদআত এবং ছবি সন্দুক, কবর, পতাকা ইত্যাদির নকশা বানায় তাও বেদয়াত এবং প্রকাশ্য যে এটা খারাপ বেদয়াত।

(ফতোয়ায়ে আজিজিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠ-৭৫)

তিনি আরো বলেন,

این چو بہا کہ ساختہ اوست قابل زیارت نیستند بلکہ قابل ازالہ اند چنانچہ در حدیث شریف آمدہ

من رای منکم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان (رواه مسلم عزيزية ج ا صف ٧٦)

যে মাজারের নকশা করা হয়, এটা জিয়ারতের উপযুক্ত নয় বরং এটা ভেঙ্গে ফেলার উপযুক্ত, যেমন মুসলিম শরীফের হাদিস, রাসুল (দঃ) এরশাদ করে তোমাদের মধ্যে কেউ শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে, সর্বপ্রথম কাজ হবে, হাত দিয়ে বারণ করা, আর হাত দিয়ে সম্ভব না হলে, মুখ দিয়ে বারণ করা, তাও সম্ভব না হলে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করা এটা একেবারে দূর্বল ঈমানের পরিচয়। (আজিজিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৬)

তাজিয়াতে সাহায্য করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন-

این ہم جائز نیست جراکہ اعانت بر معصیت می شود واعانت بر معصیت غیر جائز

(فتاوی عزیزیہ ج ا صف ۷۷)

এটা জায়েয নাই কেননা এটা গুনাহের কাজ গুনাহের কাজে সাহায্য করা জায়েয নাই। (ফাতোয়ায়ে আজিজিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৭)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রজা খাঁন বেরলভী (রঃ) এর ফতোয়াঃ

হযরত ইমাম আলী মকাম হুসাইন (রঃ) এর মাজারে পাকের নকশা বানিয়ে বরকত হাসিল করার লক্ষে নিজের ঘরে রাখার মধ্যে শরীয়তের কোন ধরণের বাধা নেই, এটা ঘরের ছবি কোন প্রাণীর ছবি নয়। এরকম প্রাণহীনের ছবি রাখাতে কোন অসুবিধা নাই। এই প্রাণহীন বস্তুকে সম্মানিত ব্যক্তিদের দিকে সম্পর্ক করে বরকত হাসিল করা অবশ্যই জায়েয আছে। যেমন হাজার বছর ধরে ওলামায়ে কিরাম হুজুর পাক (দঃ) এর না'ল বা জুতা মুবারকের নকশাকে সম্মান ও বরকত হাসিল করে আসছে, শুধু তাই না এর উপকারীতার উপর সতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন। (আশরাফ আলী থানভী "নাইলুশ্ শিফা বিনা'লিল মোস্তফা" নামক কিতাব লিখেছেন) সন্দেহ হলে ইমাম আল্লামা তলমাছানী (রঃ) এর কিতাব "ফতহুল মাতয়াল" ও অন্যান্য কিতাব রিচার্স করা যেতে পারে। কিন্তু জাহেলরা মূল ইমাম হুসাইন (রঃ) এর মাজারে পাক নষ্ট করে বিভিন্ন নকশা তৈরী করে তাজিয়া বের করে থাকে, যেমন কোন কোন জাগায় দেখা যায় পরীর ছবি, বুরাকে ছবি, বিভিন্ন ছবি দ্বারা সাজিয়ে, বক্ষের উপর ও শরীর উপর আঘাত করে শরীরকে রক্তে লাল করে, কখনো কখনো ঐ ছবিগুলো মাথা ঝুকিয়ে সালাম প্রদান করে, কখনো ঐ ছবির

যারা ইমাম হুসাইন (রাঃ) মুহব্বতে তাজিয়া বের করে, তাদের চিন্তা করার দরকার, তাজিয়াতে যা অনুষ্ঠিত হয় তা শরীয়ত অনুমতি দেয় কি না?
যেমন ইমাম হুসাইন (রঃ) এর মাজার বানানো হয়, এবং নারী পুরুষ সবাই সেই বানানো মাজারের যিয়ারত করে, এখন আমার প্রশ্ন বানানো মাজারে যিয়ারত করাকে শরীয়ত কতটুকু অনুমতি দেয়? হাদিসে পাকে রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন

لعن الله من زار بلا مزار

যে সমস্ত মানুষ মাজার ছাড়া যিয়ারত করে, তাদের কে আল্লাহ তায়ালা লা'নত করেন। হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের শুধু মাজার নয় বরং তাদের ইবাদতের স্থান ও তাদের রেখে যাওয়া তাবাররুকের যিয়ারত করার মধ্যে শরীয়তের কোন বাঁধা নেয়, বরং সেই স্থান গুলোও দোয়া কবুল হওয়ার স্থান হয়ে যায়। যেমন কুরআন করিমে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন, তাঁর নবী হযরত যাকরিয়া (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) এর ইবাদতের স্থানে দোয়া করেছিলেন। যে স্থানে হযরত মরিয়ম (আঃ) ইবাদত করতেন এবং তাঁর জন্য বেহেস্ত থেকে ফল পাঠানো হয়। সেই ফল গুলো দেখে হযরত যাকরিয়া (আঃ) সেই স্থানে ছেলের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন, অথচ তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও বন্ধ্যা ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই জায়গার উছিলায় সন্তান দান করেন যার নাম ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী

هنا لک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک
ذریة طیبة انک سمیع الدعاء (سورة ال عمران ٣٨)

সেখানে হযরত যাকরিয়া (আঃ) তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন, হে প্রভু আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনাকে অধিক শ্রবন কারী। (আলে ইমরান ৩৮)
এবং প্রিয় বান্দাদের তাবাররুকের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাবুতে ছকিনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে নবীদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন কিছু ছিল। লাঠি, জুব্বা, জুতা ইত্যাদি। আর বনি ইসরাইলরা সমস্যায় পড়লে ঐ তাবুতকে সামনে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করত এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী

قال لهم نبیهم انا اية ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة
من ربکم وبقیة مما ترک ال موسی وال هارون تحمله الملائکة
ان فی ذالک لایة لکم ان کنتم مؤمنین (سورة البقرة ٢٤٨)

তাদের নবী তাদেরকে বলেন, নিশ্চয় হযরত তালুত (আঃ) তোমাদের বাদশাহ হবে, তাঁর আলামত হল, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাবুত আসবে, যেখানে প্রশান্তি রয়েছে। এবং হযরত মুছা ও হারুন (আঃ) এর সন্তানেরা যা রেখে গেছেন, তার তাবাররুক রয়েছে। ঐ তাবুতটা বহন করে নিয়ে আসবে ফেরেস্তারা, নিশ্চয় ঐ তাবুত তোমাদের জন্য দলীল। যদি সত্যিকারভাবে তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (সুরা বাকারা -২৪৮)
উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের স্থান এবং তাদের রেখে যাওয়া জিনিষ, সাধারন বান্দাদের জন্য নিয়ামত।
আমার কথা ছিল বর্তমানে যারা তাজিয়া বের করে, এবং ইমাম হুসাইনের মাজার বানায়, সেখানে ইমাম হুসাইন (রাঃ) রেখে যাওয়া কোন বস্তু আছে কি? তিনি কি সেখানে ইবাদত করেছেন? এটাও না, তাহলে বুঝা গেল এই মাজার বানানোটা শরীয়ত সম্মত নয়। এবং উক্ত মাজারে যিয়ারত কারীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) লা'নত দেন।
সে তাজিয়াতে ঘোড়া বানানো হয়, সেটা শরীয়ত জায়েয দেয় না। বরং এ রকম প্রাণী যারা বানায় তাদের শাস্তি কি হবে সে ব্যাপারে রাসুল (দঃ) হাদিস শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ یقول
اشد الناس عذابا عند الله المصورون
(بخاری مسلم مشکواة صف ٣٨٥)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (দঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তি বেশী শাস্তি পাবে, যে প্রাণী বানায় বা প্রাণীর ছবি অঙ্কন করে।
(বুখারী, মুসলিম, মিসকাত পৃষ্টা - ৩৮৫)
অন্য হাদিসে রয়েছে,

عن عائشة عن النبى ﷺ قال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذى يضاهون بخلق الله
(بخارى مسلم مشكواة صف ٣٨٥)

রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তি অধিক আজাবে লিপ্ত থাকবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রেখে কিছু বানাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃষ্টা -৩৮৫)
অন্য হাদিসে রয়েছে,

عن ابى ہريره قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذہب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة (بخارى مسلم مشكواة صف ٣٨٥)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (দঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি কত বড় জালেম যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চাই। তারা যদি সৃষ্টি করতে করতে চায়, তাহলে তাদের উচিৎ তারা যেন পারলে অনু ও ক্ষুদ্র বস্তু শস্য ও বীজ ও যব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কখনো সৃষ্টি করতে পারবে না, তারা কেন আল্লাহ সৃষ্টি সাদৃশ্য সৃষ্টি করে? (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত -৩৮৫)
অন্য হাদিসে রয়েছে,

عن ابى ہريرة قال قال رسول الله ﷺ يخرج عنق من النار يوم القيامة لہا عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انى وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وكل من دعا الله الہا اخر وبالمصورين (ترمذى مشكواة ٢٨١)

রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নাম থেকে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট একটা জন্তু উঠবে, যার দু'টি চুক্ষু হবে যা দ্বারা সে দেখবে, দু'টি কান হবে, যা দ্বারা সে শুনবে, এবং একটি জিহবা হবে যা দ্বারা সে কথা বলবে, এবং বলবে আমাকে তিন ধরনের ব্যক্তি কে শাস্তি দেওয়ার জন্য ওয়াকিল বানানো হয়েছে।

(১) প্রত্যেক জালেম অহংকারীকে (২) যারা আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদের ইবাদত করত (৩) যারা প্রাণী বানাত বা প্রাণীর ছবি অংকন করত
(তিরমিযি, মিশকাত -৩৮৬)
অন্য হাদিসে রয়েছে,

وعن سعيد بن ابى الحسن قال كنت عند ابن عباس اذ جاء رجل فقال يا ابن عباس انى رجل انما معيشتى من صنعة يدى وانى اصنع ہذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله ﷺ سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيہا ابدا (بخارى مشكواة ٣٨٦)

হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর পাশে ছিলাম, হঠাৎ এক মানুষ আসে এবং বলে, হে ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমি এমন মানুষ, আমার সাথে আমার বানানো বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে, যা আমি নিজের হাতে বানিয়েছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, যা রাসুল (দঃ) থেকে শুনেছি, রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন, যে প্রাণী বানায় বা প্রাণীর ছবি অংকন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কিয়ামতের দিনে ঐ প্রাণী গুলোর প্রাণ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শাস্তি দেবেন। তাদের কে বলা হবে, তুমি যে প্রাণী বানিয়েছ তার প্রান দাও, যতক্ষন দিতে পারবেনা, ততক্ষন তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। (ঐ বান্দাকে দুনিয়াতে প্রাণী বানিয়েছিল, কখনো তার প্রাণ দিতে পারবেনা। স্থায়ী ভাবে আজাবে লিপ্ত থাকবে।)
(বুখারী, মিশকাত-৩৮৬) অন্য হাদিসে রয়েছে,

عن ابى طلحة قال قال النبى ﷺ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير (بخارى مسلم مشكواة صف ٣٨٥)

রাসুল (দঃ) বলেন, যেই ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি বা বানানো প্রাণী (মুর্তি) থাকবে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করবেনা।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃষ্টা -৩৮৫)

উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যারা প্রাণী বানায় ও প্রাণীর ছবি অংকন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেবেন। এবং বলবেন ঐ বানানো প্রাণীর প্রান দেওয়ার জন্য, কিন্তু বান্দা কখনো পারবে না। আর আজাবে লিপ্ত থাকবে। যে সমস্ত ভাইয়েরা তাজিয়ার মধ্যে ঘোড়া বানায়, তাদের অবস্থা কি রূপ হবে তার বর্ণনা দেওয়ার আর অবকাশ রাখেনা। সেই তাজিয়াতে ঢোল বাজানো হয়। অথচ সেই ঢোলকে আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন, যেমন-

عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال ان الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام قيل الكوبة الطبل (بيهقى مشكواة صف ٣٨٦)

রাসুল (দঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মদ পান,, জুয়া খেলা ও তবলা বা ঢোলকে হারাম করে দিয়েছেন। এবং বলেন প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু হারাম, কেউ কেউ আলকোবা বলতে ঢোল কে বুঝায়ছেন। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্টা -৩৮৬)

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, নিশ্চয় ঢোল হারাম। হ্যাঁ "সেমা মাহফিলে" যে ঢোল বাজানো হয়, তা যদি শর্ত মোতাবিক হয় তা বড় ইবাদত, যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কি (রাঃ) তাঁর "ফয়সালায়ে হাফতে মাসয়ালাতে" বর্ণনা দিয়েছেন। আর শর্তের খিলাফ হলে তা কখনো জায়েয হবে না। তাজিয়ার পিছনে যে ঢোল বাজানো হয় তা শর্তের খিলাফ, বিধায় এটা কখনো জায়েয হবে না। গান বাজনা ও ঢোলের শরীয়তের ফয়সালা অধমের **"গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি"** নামক কিতাবে দলিল সহকারে বর্ণণা করা হয়েছে।

মোট কথা হলো তাজিয়াতে যা করা হয়, তা শরীয়ত একটাও জায়েয দেয়না। বিধায় সেই শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে ফিরে আসার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের চিন্তা করার দরকার আছে, আমরা যা কাজ করি তা শরীয়ত জায়েয দেয় কিনা? ধর্ম শুধু মাত্র আভেগের উপর নয়, বিবেকেরও প্রয়োজন; যেমন মুল্লা আহমদ জিওন (রঃ) তার নুরুল আনওয়ার কিতাবে বলেন, সিরাতে মুস্তাকিমটা ঐ রাস্তাকে বুঝায়, যেটা মুহব্বত ও আকলের সমন্বয়। যেমন-

وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل فلا يكون عشقا محضا منضيا الى الجذب ولا عقلا صرفا موصلا الى الحاد والفلسفة نعوذ بالله منه (نورالانوار فى شرح المنار)

অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম যেটা মুহাব্বত ও আকলের সমন্বয়। শুধুমাত্র ইশ্‌ককে বুঝায় না যেটা মযজুব বানিয়ে দেয়, আবার শুধু মাত্র আকলও নয় যেটা মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়, আল্লাহ হেফাজত করুক।

যে তাজিয়া বের করা হয় এগুলো শুধু ইশ্‌কের উপর নির্ভর। আকল দিয়ে চিন্তা করে না; এটা শরীয়ত জায়েয রেখেছে কিনা? আমরা দেখতে পাই সেখানে ঘোড়ার মুর্তি বানানো হয়, পিছনে পিছনে ঢোল বাঝানো হয়, মহিলা পুরুষ এক সাথে মিছিল করে, আহাজারী করে, নিজের শরীরের উপর আঘাত ইত্যাদি করে থাকে, যা একটাও শরীয়ত জায়েয রাখেনি।

পরিশেষে অধম ঐ জাতের বর্ণিত হাদিস পেশ করছি, যার জন্য তাজিয়া ও মাতম করা হয়। উনি কি শিক্ষা দেন আর আমরা কি করি? যেমন মিশকাত শরীফে ও বর্ণনাটি রয়েছে। যেমন-

عن الحسين بن على رضى الله عنها عن النبى ﷺ قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكر ها وان طال عهد ها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله تبارك وتعالى عند ذلك فاعطاه مثل اجرها يوم اصيب بها (احمد بيهقى مشكواة صف ١٥٣)

হযরত ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রঃ) রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কোন মুসলিম নারী-পুরুষ যদি মছিবতে পড়ে এবং মছিবতটা যদি দীর্ঘ হয়। ঐ মছিবতকে স্মরণ করে ইন্না লিল্লাহি পড়ে রাব্বুল আলামীন তাকে প্রথম বার মছিবতে পড়ার পর ধৈর্য ধারণ করাতে যে সাওয়াব দান করেছেন, যত বার স্মরণ করে ইন্না লিল্লাহ পড়ে, ততবার সেই সাওয়াব দান করবেন। [আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত-১৫৩]

ইমাম হুসাইন (রঃ) আপন নানাজানের হাদিস পেশ করে ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন, আর আমরা তার আশেক, ভক্ত দাবী করি কিন্তু তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করি না। তাহলে বুঝা যায় কতটুকু আশিক।

আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুল (দঃ) এর দরবারে বিনয়ের সাথে আরজ করি, যে সমস্ত ভাইয়েরা শুধু মহব্বত দেখিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাতম করে ও তাজিয়া বের করে, আল্লাহ তাদের বুঝার তৌফিক দান করুক।

আমিন।

তথ্য পুঞ্জি

কুরআনুল করিম
বুখারী
মুসলিম
তিরমিযি
নসায়ী
বায়হাকী
মসনদে আহমদ
দারমী
নযহাতুল মাজালিস
দালায়েলুল খায়রাত
উসুলে কাফি
ফুরোয়ে কাফি
আস্ সিয়ারুন্ নববীয়া
জালাউন উয়ুন
নাহজুল বালাগত
তাফসিরে কুমি
তাফসিরে মজমুউল বয়ান
কিতাবুল ইলাল ওয়াশ্ শারায়ে
মান লা ইযাহদুরুহুল ফিকহ্
কিতাবুল আমালী
আখবারে মাতম
ফতোয়ায়ে আজিজিয়া
ফতোয়ায়ে রজভীয়া
বাহারে শরীয়ত
নুরুল আনোয়ার

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি ও
হালাল হারামের সুফল-কুফল
নামাজের গুরুত্ব
কুরবানীর ফজায়েল ও মাসায়েল
হজ্ব ও জিয়ারতে মুস্তাফা (দঃ) এর গুরুত্ব
মাহে রমযান ও রোজার গুরুত্ব
যাকাত ও ছদকার গুরুত্ব
মাতা-পিতা ও বান্দার হক
মৃত্যুর যন্ত্রনা
প্রিয় নবী (দঃ) এর নামে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে
চোখে মুছেহ করার গুরুত্ব
শবে বরাত, মেরাজ ও শাওয়ালের
রোযার গুরুত্ব